মহাকালের রথের ঘোড়া

একাল্পিকালের রথকথা

সম্পাদনা

দেবব্রত বিশ্বাস

MAHAKALER RATHER GHORA
KRANTIKALER KATHAKATA
Edited by Debabrata Biswas

প্রকাশক :
প্রজ্ঞা বিকাশ
বিকাশ সাধুখাঁ
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

© সম্পাদক

প্রথম সংস্করণ : বইমেলা, ২০১২

প্রচ্ছদ ভাবনা : মৃণালকান্তি দাস

ISBN : 978-93-81-684-11-5

অক্ষর বিন্যাস :
অক্ষর লেজার
২, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক :
স্পেকট্রাম অফসেট
৫বি, কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০৩৭

মূল্য : ১২০ টাকা মাত্র

সূচি

শিল্পী সমরেশ বসু : অভিজ্ঞতার বীক্ষণে
সুজিত কুমার পাল ১

বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু
স্নিগ্ধা চট্টোপাধ্যায় ৮

মহাকালের রথের ঘোড়া : সমরেশ বসুর উপন্যাস ভাবনায় পর্বান্তর
অনির্বাণ বসু ২৩

মহাকালের রথের ঘোড়া : রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোকে
সোমা মুখোপাধ্যায় ৩১

রুহিতনের কথকতা
দেবব্রত বিশ্বাস ৩৮

নকশালবাদী আন্দোলন ও 'মহাকালের রথের ঘোড়া' : একটি মূল্যায়ন
প্রভাস সামন্ত ৪৮

মহাকালের সওয়ার
অনিন্দ্য ভুক্ত ৬৫

মহাকালের রথের ঘোড়া : ইতিহাস ও কল্পনা
সুকান্ত মজুমদার ৭১

মহাকালের রথের ঘোড়া : নকশালবাড়ির ইতিহাস, ভূগোল
সেলিম বক্স মণ্ডল ৭৬

দেশকাল সন্ধানে একটি উপন্যাস : 'মহাকালের রথের ঘোড়া'
অমল মোদক ৮৭

মহাকালের রথের ঘোড়া : নামকরণ
সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৩

মহাকালের রথের ঘোড়া : নায়ক ও নামকরণ সমীক্ষা
তপনকুমার পাণ্ডে ৯৯

মহাকালের রথের ঘোড়া : কিছু নারী কিছু পুরুষ
রফিকুল ইসলাম ১০৭

মহাকালের রথের ঘোড়া : রুহিতনের জীবনে দুই নারী—টেঁপড়ি ও মঙ্গলা
অভিষেক মুসিব ১২১

মহাকালের রথের ঘোড়া : রুহিতনের জীবনে দুই নারী—টেঁপড়ি ও মঞ্জালা

অভিষেক মুসিব

সম্পদ ও প্রতিপত্তির সমস্ত ছকের বিরুদ্ধে রুহিতনের বিদ্রোহ যদি তার চরিত্রের একটা দিক হয় অপর দিকটা তাহলে স্নেহের কাঙালপনা। বিশেষ এক রাজনৈতিক আদর্শকে মাথায় রেখে সে যে আন্দোলনে নেমে পড়েছিল তাতে অনেক পুরুষের স্নেহ সে কামনা করেছে এবং পেয়েছে, কিন্তু আর পাঁচটি সাঁওতাল যুবকের মতো তার মনেও যে নারীসঙ্গ ব্যাকুল ইচ্ছার বিশিষ্টতা ছিল তা বোঝা যায় নারীজাতির প্রতি বিশেষ বিদ্বিষ্ট মনোভাবে—নিজের জীবন থেকে যার কোনো সদুত্তর সে টেঁপড়ি পর্বের আগে পায়নি। বাল্যবয়সে পারিবারিক স্নেহবন্ধন ও বন্ধু বড়কা ছেত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তার জীবন আনন্দে আবেগে কেটে যায়। এরপর তার ব্যক্তিজীবনে প্রবেশ করে দুই বিপরীত স্বভাবের নারী—টেঁপড়ি আর মঞ্জালা। এদের আকর্ষণ, ভালোবাসা, স্নেহ, প্রত্যাখ্যান রুহিতনকে জীবনপথে অভিজ্ঞ করে তুলেছে, এককথায় তাকে এরা নির্মাণ করেছে।

রুহিতনের স্নেহবুভুক্ষ মনটির পাশাপাশি নারীসঙ্গ ইচ্ছার যে ব্যাকুলতা বজায় ছিল সেই মনের ব্যাকুলতার আবরণকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল চুনীলাল মৌজার এক মাঝারি জোতদার মালিকের মেয়ে টেঁপড়ি। মাঝারি জোতদার মাসির শুকু পোঙানির জমিতে চাষ করার সূত্রেই একদিন রুহিতনের জীবনে আসে অল্পবয়সী বিবাহিতা সদস্যা টেঁপড়ি। প্রথম দর্শনেই টেপড়িকে দেখে রুহিতন মুগ্ধ হয়। টেঁপড়ির মৃদু কটাক্ষ, চোখের চপলতা, শরীরী ভাষার আকর্ষণ, সবকিছু মিলে বলিষ্ঠ যুবক রুহিতনের শরীরে শিহরণ ঘটাত—"টেঁপড়ি কেন চোখের তারা ঘোরাত, ঠোঁট মচকিয়ে হাসত, মাজা দুলিয়ে ফান ফান চলে যেত রুহিতনের গায়ে বাতাস লাগিয়ে, বুঝে উঠতে পারত না। বুঝে উঠতে পারলেও সাহসে কুলাত না। জোতের মালিকের বেটি ! অথচ ভালো লাগত। শরীরে রক্ত টগবগিয়ে ফুটত। টেঁপড়ির বুকের দোলায় তার বুকে বাঁধা শাড়ির বন্ধন খুলে যেত। রুহিতনের বুকের ধনুক টান টান হয়ে উঠত।" এখান থেকে তার জীবনে প্রথম প্রেম পর্বের সূচনা। টেঁপড়ির শরীরী ভাষার আকর্ষণে রুহিতন তার কামনাকে চরিতার্থ করতে পারলেও শেষ পর্যন্ত টেঁপড়ির সঙ্গে তার বাহা সামহা (বিধবা অথবা বিবাহিতা মেয়ে স্বামী ছেড়ে আর একজনকে বিয়ে করলে) হয়ে ওঠেনি।

একজন রাজবংশী মেয়ের পক্ষে একজন সাঁওতাল পুরুষকে বিয়ে করা অসম্ভব এটিকে সে একপ্রকার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। টেঁপড়ির এক আশ্চর্য গুণ রুহিতনকে প্রভাবিত করেছিল তা হল পুরুষ জাতের ওপর জোর খাটানো। রুহিতন টেঁপড়ির শারীরিক সঙ্গ পেলেও তাকে শুধুমাত্র কামনার সঙ্গী হিসাবে দেখেনি, তার প্রতি সে ছিল কোথাও যেন দরদী ও স্নেহানুভূতিশীল। টেঁপড়ির মুখে সে যখন তার শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের কথা শুনত

তখন সেই দুঃখ প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হৃদয়কেও স্পর্শ করে যেত। স্বল্পস্থায়ী সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রুহিতনের জীবনে টেঁপড়ি তার মনের আর একটা দিক উন্মোচন করে দিয়ে যায় তা হল আধিপত্য বিস্তার যা পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে রুহিতনকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যায়। রুহিতনের মনে প্রথম ভালোবাসার বীজ বপন করে দিয়ে যায় যে নারী তা টেঁপড়ি। পরবর্তী জীবনে টেঁপড়িকে পাওয়া না গেলেও স্ত্রী মঙ্গালাকে নিয়ে তার ভালোবাসা কোথাও থেমে থাকেনি। বলা যেতে পারে রুহিতনের প্রতিবাদী মনটি কাঙ্ক্ষিত আত্মবিশ্বাসের স্পর্শ পেয়েছে টেঁপড়ির সঙ্গে তার শরীর ও মন দেওয়া নেওয়ার পর্ব থেকেই। পরবর্তী জীবনে মুক্তাঞ্চল গড়ার লক্ষ্যে নকশাল আন্দোলনে রাজনীতির দলীয় কর্মীতে রুহিতন নাম লেখালেও জীবনে অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিল টেঁপড়ি তার নিঃসঙ্গ জীবনের প্রথম সঙ্গী। টেঁপড়ির সঙ্গে বিচ্ছেদকে মেনে নিতে না পারায় মনের জ্বালায় ব্যর্থ প্রেমের ক্ষোভ নিয়ে বাবা পোশ্‌পত কুরমির উদ্যোগ রুহিতন একদিন মঙ্গালাকে বিয়ে করে বসে। প্রাক্ বিবাহিত জীবনে টেঁপড়ি তার চোখে যে নেশা ও মনে রঙ ধরিয়েছিল তাকে কিছুটা হলেও ভুলতে পেরেছিল মঙ্গালার শান্ত নীরব ভালোবাসায়। মঙ্গালা রুহিতনের জীবনে সেই নারী যে কল্যাণ মমতা আর প্রচ্ছন্ন নীরব ভালোবাসার দ্বারা অস্থিরচিত্ত যুবকের হৃদয়ে এক বিশেষ আদর্শকে সচল করে রাখতে পেরেছিল। রুহিতন কুরমির জীবনে রাজনৈতিক দিকটি যদি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয় তাহলে সেই রাজনৈতিক জীবনে অন্তঃসলিলা রূপে বিরাজ করে একজন নারীর স্নেহময়ী রূপ সে হল মঙ্গালা। তাই জেল জীবনে যখনই কোনো অত্যাচার বা অসহায়তার সম্মুখীন হয় সেইসময় তার মনে পড়ে যায় মঙ্গালার কথা। জেলে থাকাকালীন অফিসারের সিগারেট খাওয়ানোর প্রসঙ্গে রুহিতনের স্মৃতিতে ভিড় করে আসে মঙ্গালার সংসার জীবনের কথা—"একই চালার নীচে তার সংসার। পরিবারের সকলের থাকা খাওয়া রান্না শোয়া আর দুটো বলদের আস্তানা। রাত্রের অন্ধকার তখনও পুরোপুরি কাটত না। কিন্তু আলো জ্বালা হত না। বাইরের ঢাকা দাওয়ায়, ছোটো লকড়ি কুটোকাটির আগুনের শিখাতেই সব দেখা যেত। সে ডেকে না দিলেও মঙ্গালা উঠে পড়ত ঠিকই। পোড়া মাটির ছোট উনানে কাঠকুটো জ্বেলে, অ্যালুমিনিয়ামের একটা পুরনো বাটির মুখ ঢেকে জল বসিয়ে দিত। রুহিতনের মা চা খায়। বেঁচে থাকতে তার বাবাও খেত। তার বুড়ি মায়ের সঙ্গে নাতি-নাতনিগুলোও হা হা করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু মঙ্গালা চায়ের জল বসিয়েই বলদ দুটোকে খাওয়াতে চলে যেত।"—একজন সাধারণ গৃহবধূ হিসেবে পারিবারিক কাজকর্মের ব্যস্ততায় নিজেকে ব্যাপৃত করে রাখতে সে যেন অদ্বিতীয়া। মুক্তাঞ্চল গড়ার লক্ষ্যে রাজনীতি নির্ভর জীবনে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেও সে কখনও মঙ্গালাকে ভুলতে পারেনি। রুহিতনের মনে পড়ে যায় তার অসুখের সময় মঙ্গালার পাশে থাকার কথা, মঙ্গালার সেবা যত্নের কথা—'জ্বরজ্বালা হলে গা হাত পা ব্যাথা হলে মা কী সব গাছের ছাল লতাপাতা ছেঁচে, জ্বাল দিয়ে ফুটিয়ে খাইয়ে দিত। মায়ের চোখে ছানি পড়ার পরে, মঙ্গালা দিত। মঙ্গালা তার মায়ের কাছ থেকেই শিখে নিয়েছিল। বেশি বাড়াবাড়ি হলে, দোকান থেকে ডাক্তারি বড়ি কিনে খেত। তবে তার বিশেষ দরকার হত না। গাছের ছাল লতাপাতা ফোটানো নির্যাসেই কাজ হয়ে যেত। ডাক্তারের দোকানের ওষুধের দাম কত! বেজায়। আর তা কি কাছেপিঠে পাবার

উপায় ছিল ? তা ছাড়া, মঙ্গালা কী সব তুকতাক করত !.....মঙ্গালার মুখটা মনে পড়ছে। চোখের সামনে ভাসছে। রুহিতনের কী হাসিই পেত, মঙ্গালা যখন তার মাথার যন্ত্রণা হলে, একটা কাঠি দিয়ে কপালের ওপর কী সব আঁকিবুকি কেটে দিত। রুহিতনের বুকের ওপর পড়ে, নুয়ে এসে, ঠোঁট নেড়ে নেড়ে যেন কোনও মন্ত্র উচ্চারণ করত আর এক কানের কাছ থেকে শুরু করে, কপালের ওপর দিয়ে কাঠি নানাভাবে বুলিয়ে আর এক কানের কাছে নিয়ে যেত। যেন মঙ্গালা কোনো মন্ত্র আওড়াত আর তা-ই লিখে দিত রুহিতনের কপালে। মাথার যন্ত্রণা কি তাতে কমত ? হয় তো না, তবু কেমন একটা আরাম বোধ হত। সেটা ছিল মঙ্গালার স্পর্শের গুণ।"

মঙ্গালার স্পর্শের গুণে রুহিতনের যন্ত্রণা হয়তো কমত না তবু একজন স্নেহময়ী নারীর স্পর্শে ভিতরের জমে থাকা বিষণ্ণতা যেন কিছুটা লাঘব হত। মঙ্গালা শুধুমাত্র রুহিতনের স্ত্রী নয়—এক স্নেহময়ী নারীর কল্যাণময় রূপের প্রতীকও মঙ্গালা। 'মঙ্গালা' নামটির মধ্য দিয়ে এই তাৎপর্যটিও থেকে যায়। মঙ্গালাকে আমরা কর্তব্যে যেমন স্নেহপরায়ণ রূপে দেখি, তেমনি স্বভাবেও সে ছিল একজন শান্ত সরল সাধারণ মেয়ে। মঙ্গালাকে রুহিতন যত দেখে ততই মুগ্ধ হয়। জীবনানন্দের বনলতা সেনের মতোই মঙ্গালার চোখের মণিকুন্ডে রুহিতন তার অশান্ত বিক্ষুব্ধ জীবনে আশ্রয় খুঁজে পায়—"হ্যাঁ ঝোরার জালের ধারা যেখানে গভীর কূপের মতো কুন্ডকে ভরিয়ে তোলে, তখন তার নাম হয়ে যায় মণি। সেই কুন্ড তখন হয়ে ওঠে মাতৃকূপের প্রতীক। আর সেই প্রতীককে মানুষ পূজা করে। জলের প্রাচুর্যের প্রার্থনায়। আসলে, তরাইয়ের পানীয় জলের একটি প্রাকৃতিক আধার। গভীর জল সেখানে বারোমাস। মনি তো স্ত্রী ইন্দ্রিয়ের আর এক নাম। রুহিতনের মনে হত মঙ্গালার সেই কুন্ডের গভীর কালো জলের মতো চোখে তার সতেরো বছরের জীবনটা ডুবে গিয়েছে।" কিন্তু মঙ্গালার একনিষ্ঠ ভালোবাসায় সে সংসার জীবনে আত্মস্থ হতে পারেনি। তার জীবনের আদর্শ তাকে মঙ্গালার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। রুহিতনের মনে পড়ে যায় বহুকাল পূর্বে দলীয় সমাবেশ উপলক্ষে কলকাতা আসা প্রসঙ্গো মঙ্গালার আর এক নারীরূপের কথা। গর্ভে সন্তান থাকার দরুন চা বাগানের অন্যান্য দলীয় কর্মী ও তাদের বউদের সঙ্গো সে আসতে পারেনি। মঙ্গালাদের কাছে কলকাতা শহর স্বপ্ন, যে কলকাতা তাদের বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। হয়তো জীবনে আর কোনোদিন কলকাতা দেখার সুযোগ হবে না বলেই অনেক দিন পূর্বে বাপের ঘরে জমানো সযত্নে গচ্ছিত নিজের শেষ সম্বলস্বরূপ পাঁচটা টাকা রুহিতনের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করেনি কলকাতা থেকে কিছু নিয়ে আসার জন্য—'কলকাতায় যাচ্ছ, একটা কত বড়ো কথা ! এ তো আর বিজনবাড়ি সফর মেলা না, না কি অ্যাঁ ? অধিকারী বাবার বাঘ মেলাও না, অ্যাঁ ? তাই বলছি মায়ের জন্য কিছু নিয়ে এসো। কলকাতার কোনও চিহ্ন।' মঙ্গালার এই সরল ছলনা বুঝতে অসুবিধা হয়নি রুহিতনের। কিন্তু রুহিতন শেষ পর্যন্ত কলকাতা থেকে কিছু নিয়ে আসতে পারেনি। বলা যেতে পারে সভার পূর্বে তার চোখে শহর কলকাতার যে উন্মাদনা ছিল, নগর কলকাতার বাস্তব রূপ দেখে সে আর কিছু কিনতে আগ্রহী হয়নি। তাদের সংসার জীবনে দুজনের দুঃখ বেদনা, দুজনকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল, বিষাদ ছায়াঘন দুটি মন পরস্পরের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল ঐকতানের সুর।

মঞ্জালার স্নেহশীল নারীসত্তার পাশাপাশি লুকিয়েছিল তার আর এক প্রতিবাদী নারীসত্তা। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে নিজের অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সমাজকর্তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ডাইনী পোড়ানোর মতো নিন্দনীয় ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো—এ বড়ো কম কথা নয়। এই মঞ্জালা অনেক বেশি প্রগতিশীল, প্রতিবাদী আধুনিক। সমাজে জমে থাকা কুসংস্কারকে মেনে নেওয়া যে কতবড় অপরাধ, তা মঞ্জালাই প্রথম সমাজবাসীকে সতর্ক করে দেয়। মঞ্জালার এই প্রতিবাদ তাকে নতুন করে চিনিয়ে দেয় লড়াকু শ্রমিক নেতা রুহিতন কুরমির বউ হিসেবে—রুহিতনের জীবনে এ বড়ো কম পাওনা নয়! মঞ্জালার প্রতিবাদী সত্তা তাকে তার রাজনৈতিক জীবনে নতুনপথের সন্ধান দেখায়। একজন সাধারণ ভূমিহীন কৃষক হলেও মঞ্জালাকে নিয়ে রুহিতনের জীবনে শখ, আহ্লাদের কোন ঘাটতি ছিল না। বন্ধু বড়কা ছেত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রঙ্গা তামাশার জীবনকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে উপভোগ করার মতো রসদ তাদের জীবনেও কিছু কম ছিল না। রুহিতনের কথায়—"দুজনে বউদের নিয়েও মেলায় চলে যেতাম। গান শুনতাম, মেলায় বায়োস্কোপ দেখতাম, জুয়া খেলতাম, মদ পাচুইও খেতাম। আর বউয়েরা আমাদের তাড়া দিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেত। অল্প বয়সে বড় সুখের দিন ছিল বটে।" কিন্তু সেই সুখ রুহিতনের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যে রুহিতন কুরমি একজন লড়াকু শ্রমজীবী নেতা, যার চোখে তরাই অঞ্চলকে মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার ভরপুর স্বপ্ন, তাকে ঘরে বেঁধে রাখবে কে? না মঞ্জালাও পারেনি বরং মঞ্জালার প্রতিবাদী সত্তা তার রাজনৈতিক জীবনে নতুন পথের সন্ধান দেখায়। রাজনৈতিক জীবনে সে আর পিছনে তাকানোর সুযোগ পায়নি, শেষ পর্যন্ত নকশাল আন্দোলনের একজন ব্যর্থ নায়ক রূপে খুন, লুঠ, আগুন লাগানো, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল বহুবিধ অপরাধের অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে জেলে যেতে হয়।

রুহিতন জেলে থাকাকালীন তার পিছনের জীবনটাকে ঝরঝরে শুকনো ধানে মরা ধান খোঁজার মতো খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করে সে কুষ্ঠ রোগ অর্জন করেছে তাদেরই দলের একজন সদস্য পেরওয়ার কাছ থেকে। দেহে কুষ্ঠ রোগ বাসা বাঁধার ফলে তার জীবনে যে একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা তা যেন নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতারই এক প্রতীকি রূপ। ডাক্তারের পরামর্শ মতো সঠিক পরিচর্যায় কুষ্ঠরোগ সেরে যায় এই বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়েই সে আবার মঞ্জালার কাছে ফিরে যেতে চায়। মনের অদম্য কৌতূহল ও স্ত্রী পুত্র কন্যাদের দেখতে পাবে কিনা এই তীব্র সন্দেহ নিয়ে সে মুক্তাঞ্চলের পথে পা বাড়ায়। কিন্তু তরাইয়ের চুনীলাল মৌজায় এসে সে দেখতে পায় তার স্বপ্নের মুক্তাঞ্চলের সঙ্গে বাস্তবের কেনো মিল নেই, বরং এখানে বেশি করে জোতদারদের রাজত্ব চলছে। তাই সে স্বপ্ন ব্যর্থতার ক্ষোভ নিয়ে মঞ্জালার সংসার জীবনে ফিরে আসে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে, কিন্তু মঞ্জালাও আর সম্পূর্ণরূপে তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। রুহিতন দেখে সবকিছু বদলে গেছে, এমনকি মঞ্জালাও। মঞ্জালার কথাতেই রুহিতন সে বিশ্বাস ফিরে পায়—"বদলে তো যাবেই সবাই বদলে গেছে। তোমার সময় একরকম ছিল, এখন আর একরকম। আমরা যে বেঁচে আছি সেটাই তো তাজ্জব।"

গ্রাম্য সমাজের জমে থাঁকা অন্ধ কুসংস্কার আবার মঞ্জালাদেরকে চেপে বসে। যে মঞ্জালা একদিন ডাইনী পোড়ানোর বিরুদ্ধে সমাজের শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল সেই

মঙ্গালাই আজ মারাংবুরুর দয়ায় বেঁচে থাকার কথা বলে। তাই মারাংবুরুর দয়া নির্ভর জীবনে কুষ্ঠব্যধি আক্রান্ত রুহিতনের স্থান হয় সম্পূর্ণ এক পৃথক ঘরে। মঙ্গালার কাছ থেকে শোনা সেই উপকথার কাহিনির মতো নকশাল আন্দোলনের মন্ত্রপড়া জলে রুহিতন নতুন করে যেন মঙ্গালাকে আবিষ্কার করে। মঙ্গালার এই আকস্মিক পরিবর্তন সে মেনে নিতে পারেনি। স্ত্রী পুত্রদের সঙ্গে সংসার জীবনের সুখস্বপ্নও যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে তখন সে আর মঙ্গালার দেওয়া খাবারকেও মুখে তুলতে পারেনি। অপমান আর অভিশপ্ত আশ্রয় থেকে ফিরে গেছে যথার্থ জায়গায়, নিজের জীবনে সঞ্চিত শেষ আশ্রয়ের কাছে। যার কাছ থেকে সে পেয়েছিল জীবন শক্তির উৎস সেখানেই সে পেয়ে যায় চরমতম আশ্রয়, জীবনের গভীরতম ঘুম।

রুহিতনের জীবনে তার মায়ের প্রভাব অল্প হলেও তার সমগ্র জীবনে ভিড় করে আছে দুই নারী। টেঁপড়ি যৌবন মুহূর্তের সঙ্গী রূপে দেখা দিলেও পরবর্তী জীবন থেকে অচিরেই মিলিয়ে যায়। মঙ্গালার সঙ্গে বিবাহিত জীবনে সে আর একবার টেঁপড়ির কাছে ফিরে গেলেও পায়নি। ততদিনে তার বিপুল কর্মজীবন রাজনৈতিক জীবনে তাকে তার নিজস্ব প্রত্যয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। এরপর বিপুল কর্মোদ্যত রাজনৈতিক জীবন তার কাছ থেকে মঙ্গালাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় কিন্তু সে জীবনে তার অসম্পূর্ণ সম্পর্কের ছাপ পুরোপুরি মুছে যায়নি। তাই সে জেল থেকে ফিরে বুধুয়া আর করমাকে দেখে তার মন স্নেহশীল হয়ে পড়ে। মঙ্গালার সঙ্গে পুনরায় সংসার করার ইচ্ছা হয়। কিন্তু এখানে এসে জানতে পারে জীবনের একটি কঠোর সত্য, একটি নির্মম পরিহাসের কথা—মঙ্গালা কুষ্ঠব্যাধি রুহিতনের সঙ্গে থাকতে চায় না। মঙ্গালার আকর্ষণ স্নেহ ভালোবাসা একদিন যে রুহিতনকে জীবনপথে অভিজ্ঞ করে তুলেছিল জীবনের শেষ লগ্নে সেই নারীর অনাদরই তাকে আবার জীবন পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে। জীবনের চূড়ান্ত একাকিত্বের যন্ত্রণাকে সহ্য করা আর তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। শেষত সব সঙ্কোচ ত্যাগ করে রুহিতন হয়তো সারেন্ডার করে মৃত্যুর কাছে। নিজের জীবনের আদর্শকে সে আর বিচ্ছিন্ন করতে চায়নি এদিক দিয়ে মঙ্গালাই যেন তার জীবনবৃত্তটিকে পূর্ণ করে তোলে।